৬.৮ ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ
Women's participation in Indian politices

ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ধারাটি বরাবর একই খাতে বয়ে যায়নি। স্বাধীনতার আগের কয়েক দশকে ভারতীয় নারীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের

Scanned with CamScanner

পরের দু'দশকে ভারতীয় নারী বিভিন্ন কারণে রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ১৯৭০-এর দশক থেকে পুনরায় ভারতের নারী এবং বিভিন্ন নারী সংগঠন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক, ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে নিম্নোক্ত দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করে দেখানো হল।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব (Pre-independent period) :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ভারতে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলেছিল, ভারতীয় নারীর সঙ্গে রাজনীতির যোগ সেখান থেকেই শুরু। ওই সময় যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তা একদিকে নারী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল এবং অন্যদিকে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে বিদূরিত করতে চেয়েছিল। তবে ওইসব আন্দোলনের সঙ্গে যেসব নারী জড়িত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রধানত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় কিছু মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল যাদের নেতৃত্বে ছিলেন **নলিনী দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী** প্রমুখ। অন্যদিকে মাদ্রাজে গড়ে উঠেছিল কতিপয় মহিলা সংগঠন, যথা—**উইমেনস্ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন** (WIA, 1917), **অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স** (AIWC, 1927) ইত্যাদি। এইসব মহিলা সমিতি ও সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর স্বাধীন অস্তিত্বকে তুলে ধরা। এইসব উদ্যোগের পরিণতিস্বরূপ মহিলারা ক্রমশ বেশি বেশি করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে, বিশেষ করে **ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির যোগদানের সময় থেকে।** গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সমস্ত স্তরের হাজার হাজার ভারতীয় রমণী ঘরের বাইরে পা রাখেন। তাঁরা মিছিলে যোগ দেন, মদের দোকানে পিকেট করেন, জেল খাটেন এবং লাঠি-গুলির মুখোমুখি হন। এমনকি শিশু সন্তানদের কোলে নিয়েও বহু মা জেলে গেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামীদেরও ভারতীয় মহিলারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন পলাতকদের আশ্রয় দিয়ে, গোপন অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে, বিপ্লবীদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর সরবরাহ করে ইত্যাদি নানাভাবে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে **কল্পনা দত্ত, কণকলতা বরুয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** প্রমুখ বীরাঙ্গনা নারীকে সরাসরি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত গান্ধিজির খাদি আন্দোলন ভারতীয় নারীদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করে। তাঁরা বিদেশি বা মিলের শাড়ি পরিত্যাগ করে খাদিবস্ত্র পরিধান করতে থাকেন।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ এবং স্বাধীনোত্তর যুগ—এই দুয়ের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কয়েকটি স্থানে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়, যেমন বাংলায় **তেভাগা আন্দোলন** (১৯৪৬-৫০), অন্ধ্রপ্রদেশে **তেলেঙ্গানা আন্দোলন** (১৯৪৮-৫১) ইত্যাদি। উভয় আন্দোলনেই গ্রামের মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা নারী বাহিনী গঠন করেন এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনোত্তর পর্ব (Post-independent Period) :

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় নারীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছিল, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দু'দশকে তাতে কিছুটা ভাটা পড়ে। এই সময়ে মহিলারা আগের মতোই গৃহস্থালি কাজকর্মে বেশি মনোযোগ দেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কিছু সমাজকল্যাণকর কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। যেসব মহিলা মন্ত্রিপরিষদে স্থান পেয়েছিলেন, তাঁরা স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ, তথ্য ও সম্প্রচার প্রভৃতি দপ্তরগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। যেসব মহিলা সমিতি টিম টিম করে চলছিল, সেগুলি সরকারের লেজুড়ে পরিণত হয়। **'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'**(AIWC)-এর ন্যায় সংগঠন অনৈক্য, দলাদলি এবং অন্যান্য কারণে ভেঙে যায়। এককথায়, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে ভারতের মহিলারা রাজনীতির কঠিন জায়গাটি পরিত্যাগ করে আগের মতো 'সেবা'র আদর্শে ফিরে যান।

ভারতের নারী আন্দোলনে নারীদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ভূমিকা শুরু হয় ১৯৮০-র দশক থেকে। তাই অনেকে এই পর্যায়ের আন্দোলনকে ভারতের নারী আন্দোলনের **তৃতীয় পর্যায়** বলে অভিহিত করেন। এই পর্যায়ে ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যাদের কাজ হল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, চাকরি, মজুরি এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

Scanned with CamScanner

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল **সাধারণ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ**। এ বিষয়ে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতামত শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, **এস ডি. মুনি** (S. D. Muni) কর্তৃক প্রণীত *Women in the Electoral Process* শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম। **মিলব্রাথ ও গোয়েল** (L. W. Milbrath and M. L. Goel) প্রণীত *Political Participation* নামক গ্রন্থেও এই ধরনের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, প্রকৃতিগতভাবে ভারতীয় মহিলারা রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাহী। অপরদিকে **ডঃ সংঘমিত্রা সেন চৌধুরী** তাঁর *Women and Politics : West Bengal* শীর্ষক গ্রন্থে দাবি করেছেন, সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা পুরুষের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। তিনি দেখিয়েছেন, জরুরি অবস্থার পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে মহিলাদের প্রদত্ত ভোটের হার পুরুষদের থেকে বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে মহিলা ভোটদাতাদের ভোট প্রদানের হার বেশি। অন্যভাবে বললে ভোট না দেওয়ার প্রবণতা গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে শহরাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যেই বেশি।

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সূচক হল **আইনসভায় মহিলা সদস্যদের সংখ্যা এবং ভূমিকা**। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষেই মহিলা সদস্য সংখ্যা যথেষ্ট কম। লোকসভাতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় একই জায়গায় রয়ে গেছে। এই সংখ্যাটি বরাবর ৯ শতাংশেরও নীচে থেকে গেছে। রাজ্যসভাতেও একই চিত্র দেখতে পাই। সেখানেও দেখা যায়, মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা কখনই ১০ শতাংশের সীমা ছাড়ায়নি। কারো কারো মতে, ভারতের সংসদে মহিলা সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার জন্য দায়ী রাজনৈতিক দলগুলি। নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আস্ফালন করলেও কোনো দলই মহিলাদের জন্য ব্যাপক হারে লোকসভা অথবা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীপদ উন্মুক্ত রাখেনি। কংগ্রেস দল ১৯৩১ সালের করাচি অধিবেশনেই নারীদের জন্য সমানাধিকার দাবি করে। স্বাধীনতার পরও এই দল প্রথম লোকসভা নির্বাচনে অন্তত ১৫% প্রার্থীপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলেছিল। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে **পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানটা কী।** ২০১৪ সালে প্রণীত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে সকল স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০% আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। জনজীবনে ব্যাপক নারী প্রতিনিধিত্বের এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা এখানে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে মহিলা প্রার্থীরা জনসমর্থনের আশায় মিটিং-মিছিল করেছেন, প্রচার চালিয়েছেন দরজায় দরজায়। তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে এই ধরনের পরিবর্তন নারীকে দিয়েছে সাহস, সামাজিক স্বীকৃতি ও কিছু ক্ষমতা। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, পরিচালনা ও পরিষেবার ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা ভালো কাজকর্ম করছেন। তাঁরা গার্হস্থ্য কাজকর্ম সামলে নিয়মিত সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন এবং দক্ষতার সঙ্গে বহু দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সকল রাজ্যে সমান নয়। উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচনি পর্যায়ে সামিল হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের মধ্যে অল্পবিস্তর অনীহা দেখা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, গরিব কৃষিজীবী পরিবারের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মহিলাদের পঞ্চায়েতি কাজকর্মে অংশগ্রহণের হার ও মান অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে।

রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষস্থানীয় সংগঠনে মহিলাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ১৯৯৬ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মহিলা ও পুরুষদের সংখ্যা হল যথাক্রমে ২ এবং ১৮ জন। বি. জে. পি-র জাতীয় কার্যকরী কমিটির ১৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন মাত্র মহিলা। সি. পি. আই. (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ৭২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন মহিলা। সি. পি. আই-এর জাতীয় কার্যকরী কমিটির ৩১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন মহিলা। জনতা দলের জাতীয় কার্যকরী কমিটির ১৪৭ জনের মধ্যে ১১ জন মহিলা আছেন।

Scanned with CamScanner

১৯৯৬-এর ১২ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের এক-তৃতীয়াংশ আসন-সংরক্ষণের প্রস্তাব সম্বলিত একটি সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করেন। বিলটি অনুমোদিত হলে সংসদে ৩৩% মহিলা সাংসদ থাকতেন অর্থাৎ লোকসভায় ১৮০ জন। রাজনীতিতে তাহলে নারীর অবস্থান এক সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছাতো। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে এই বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি এবং তারপরও কয়েকবার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আসলে আইনসভার অধিকাংশ পুরুষ সদস্য এ ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নন। তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, প্রাক্-নির্বাচন পর্বের প্রতিশ্রুতি মতো সংরক্ষণ কার্যকর হলে তাঁদের আসনসংখ্যা হ্রাস পাবে। উপরাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন-এর মতে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন দিয়ে এই সংরক্ষণের দাবি করেননি, করেছেন ভোটের জন্য।

Scanned with CamScanner